138

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN. 2 4 1999
পৃঃ ৫ কলাম ২

শিক্ষার মানগত বৈষম্য

মজিবর রহমান

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের ১৯৯৮ সালের বার্ষিক রিপোর্টে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, বিসিএস ক্যাডারে চাকরির জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের অধিকাংশই আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তান এবং তাদের বেশির ভাগের পিতাই উচ্চশিক্ষিত। এই ক্যাডারে চাকরির ক্ষেত্রে নিম্নবিত্তের সন্তানদের হার দিন দিন কমছে। ভোরের কাগজ-এ প্রকাশিত এতৎসংক্রান্ত রিপোর্টে আরো দেখা যাচ্ছে, অঞ্চল হিসেবে ঢাকা বিভাগের প্রার্থীরাই বিসিএস ক্যাডারে সুযোগ পাচ্ছে বেশি। এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য আবার ব্যাপক। রিপোর্টটিকে হালকাভাবে না নিয়ে তার ভিতরগত নির্যাস হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। তাতেই বেরিয়ে আসবে স্বদেশের যাত্রাপথ।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ঐ পরিসংখ্যানে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, যে শিক্ষা ও জ্ঞান থাকলে পরে বিসিএস ক্যাডারের চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে টেকা যায়, সেই শিক্ষা ও জ্ঞান নিম্নবিত্তের মানুষের সন্তানরা অর্জন করতে পারছে না। পারছে না বিত্তশালীদের সন্তানরাও, যারা পড়াশোনার পাট চুকিয়েছে ঢাকার বাইরে থেকে। আবার ঢাকায় থেকেও সম্ভব হচ্ছে না অধিকাংশের পক্ষে তাদের সন্তানকে সেই শিক্ষাটা দেওয়ানো, যে শিক্ষায় বিসিএস ক্যাডারে উচ্চপদের চাকরি পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ, শিক্ষা এখন খুবই উচ্চমূল্যের পণ্য যা কেনার সামর্থ্য সাধারণ আয়ের মানুষের নেই। অপরদিকে সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতার দরুন বিত্তবৈভব যথেষ্ট পরিমাণে থাকার পরও ঢাকার বাইরের বাসিন্দার পক্ষে তা কেনা সম্ভব হচ্ছে না।

তার অর্থ উন্নয়নের অন্যসব ক্ষেত্রের ন্যায় প্রতিযোগিতায় টিকে যাওয়ার মতো শিক্ষা কেন্দ্রীভূত ঢাকাতে। সেটি অবশ্য প্রচণ্ড খরচসাপেক্ষ, যে কথা আগেই উল্লিখিত। এই খরচ যতোই অত্যুগ্র হোক তা কোনো ব্যাপারই না ঢাকার একটি শ্রেণীর কাছে। তাদের হাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আছে। সেটি বৈধই হোক কিংবা হোক অবৈধ পথের। এই ব্যয়ক্ষমতার সুযোগ পুরোমাত্রায় নিচ্ছে সুযোগসন্ধানী বিনিয়োগকারীরা। তারা ব্যবসা খুলে বসেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। ডোনেশন ও বেতনের নামে লাখ লাখ টাকা কামাই হচ্ছে তাতে। বিনিময়ে যে শিক্ষাটা দিচ্ছে সেটা প্রতিযোগিতায় টেকার মতোই। ঢাকার বাইরে অন্যত্র এতো অর্থের ছড়াছড়ি নেই, তাই নামও নেই বড়ো ধরনের চাকরির খাতায়। এই-ই হচ্ছে বাস্তবতা।

সেই বাস্তবতার নিগূঢ়ার্থ হচ্ছে বৈষম্য। প্রতি পদে বৈষম্য বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, এর রাশ টেনে ধরতে না পারলে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হবে। দেশ যতো বেশি এগোচ্ছে (এগোচ্ছে নিঃসন্দেহে) বৈষম্য বাড়ছে অতো বেশি। ধনিক শ্রেণী যদি তিন/চার ধাপ আগায় তো গরিব সেখানে আগায় একধাপ। এভাবেই পাহাড়প্রমাণ হচ্ছে ব্যবধান। ফলশ্রুতিতে হচ্ছেটা এই যে, গরিব শ্রেণীর থাকা-খাওয়া-পরার কষ্ট কমছে ঠিক, কিন্তু তারা স্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারছে না। অত্যধিক চড়া মূল্যে হাত ঘুরে সেটি চলে যাচ্ছে ধনিকদের হাতে। একই অবস্থা হচ্ছে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে। চিকিৎসার কথাই ধরা যাক। সেটিও এখন অস্বাভাবিক দাম দিয়ে কিনতে হয়। সে সাধ্য গরিব মানুষের নেই। তার জন্য তাই চিকিৎসাও নেই। নেই উঁচুদরের শিক্ষাও, যা বিক্রি করে একটা চাকরি জোটানো যায়। সরকারি সেবার খাতকে সম্প্রসারিত ও উন্নততর করে গরিবের প্রাপ্তি বাড়ানো যায়। যতোদিন না সমাজের অনগ্রসর অংশ কমবেশি সক্ষমতা অর্জন করে, ততোদিন তাদের প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখতেই হবে সরকার ও সমাজপতিদের। উন্নয়নের বেসরকারি মডেলের বিরোধিতা কেউ করছে না, যেটি কাঙ্ক্ষিত তা হলো অনগ্রসর অংশের জীবনমান উন্নয়নের প্রশ্নে তাদের পক্ষে পরিকল্পিত ও দৃঢ় অবস্থান। নয়তো এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যে সমাজে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হবে একদিন।

গত ১৭ জুন ১৯৯৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পরদিন ১৮ জুন ভোরের কাগজ সেই ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলেছে, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও মেধাতালিকা সীমিত রয়েছে শহরকেন্দ্রিক নাম করা স্কুল ও ক্যাডেট কলেজের মধ্যে। এর বাইরে গ্রামাঞ্চলে যে হাজার হাজার স্কুলের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোর কোনোটিরই মেধাতালিকায় কোনো নাম নেই। খোঁজ নিলে নিশ্চিত দেখা যাবে, ওসব স্কুলের পাসের হার নগণ্য। যারা পাস করেছে তারা কোনোরকম উতরিয়ে গেছে হয়তো পরীক্ষাটা। সেই উতরানোই সার। এদিয়ে চাকরি জোটানো কঠিন হবে। যদি জোটানো যায় সে হবে কেরানির চাকরি। ইদানীং অবশ্য কেরানির চাকরিও দুর্লভ।

> **দেশের একটি অঞ্চল আলোকিত হবে, আর সকল অঞ্চল নিমজ্জিত থাকবে অন্ধকারে এমনটি কাঙ্ক্ষিত নয়। মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ লোক বাস করে শহরে, বাকি সকলে গ্রামে। সেই গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা একেবারেই মানহীন। একে মানসম্পন্ন করার পরিকল্পিত উদ্যোগ দ্রুতই নেওয়া দরকার।**

অফিসারের নিচে এক গার্ড-মেসেঞ্জার-পিয়ন ছাড়া কোনো পদই আর রাখতে চাইছে না ব্যাংকসহ বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ইউনিয়নের ভয়ে এ রকম সিদ্ধান্তের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সর্বত্র। কর্মচারী হলে ইউনিয়নে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়ে কাজে ফাঁকি দেওয়ার পথ খোঁজে অনেকেই অফিসার হলে এমনটি সম্ভব না— এ রকম ধারণা থেকেই অফিসার দিয়ে সকল কাজ সম্পন্নের কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। তাতে হয়েছেটা এই যে, আইএ, বিএর সাধারণ পাসে চাকরি প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত হয়ে আসছে, অপরদিকে সংখ্যাধিক্য ঘটছে এই পাসেরই। গ্রামাঞ্চলে সে আরেক নতুন সমস্যা। স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরোনো যুবক ক্ষেতখামারের কাজে যেতে চায় না, শুধুই চাকরি খুঁজে বেড়ায়। না পেয়ে এক সময় হতাশ হয়, তারপর হয় নিস্পৃহ সবকিছুতে। এ অবস্থায় অভিভাবকরা পরবর্তী সন্তানকে পড়াশোনা করাতেই ভয় পান। প্রতিকারের উপায় হিসেবে আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির পক্ষে জোরালো প্রচার ও সহায়তার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা যায়।

ঢাকার বাইরে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো বটেই, শহরাঞ্চলেরও অধিকাংশ স্কুল-কলেজ নানারকম সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে প্রধানতমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক। আয়ের উৎস হিসেবে ছাত্র বেতন সেখানে নগণ্যপ্রকৃতির। সমাজের গণ্যমান্য ও অবস্থাসম্পন্নদের অনুদান বলতে গেলে নেই-ই। যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য তারা করেন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পারলৌকিক চিন্তা থেকে। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে করেন দলাদলি পরিচালন বোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য। সেও আরেক বড়ো ধরনের সমস্যা। ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে প্রধান শিক্ষকের পক্ষে কাজ করাই মুশকিল। আপোসরফা করতে পারেন না যিনি, তার পক্ষে প্রধান শিক্ষক হিসেবে টেকাই কঠিন। বস্তুতপক্ষে ঢাকার বাইরে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস খুবই দুর্বল রূপের। আয় যা হয় তা পরীক্ষা উপলক্ষে ফরম ফিলআপের সময়। পরীক্ষার্থী বেশি হলে আয় একটু বেশি হয়, তাই তারা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

বৃদ্ধির প্রতি আগ্রহী থাকেন। এর বাইরে আয়ের প্রধান উৎস সরকারি অনুদান। শিক্ষকরা তাদের বেতনের সরকারি অনুদানের অংশটাই নিয়মিত পান। বাকিটুকু অনিশ্চয়তায় ভরা। এ রকম অনিশ্চিত অবস্থায় মেধাবী কেউ শিক্ষকতা পেশায় আসতে চান না। যাদের অন্যত্র কোনো গতি হয় না তারাই আসেন এ পেশায়, অন্তত প্রাইভেট কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেলায়। ফলে শিক্ষাদানের আসল কর্মটিই হয় নামসর্বস্ব। গুণগতমান বলতে এখানে কিছু নেই। ভালো ফলাফল করবে কি করে ছেলেমেয়েরা? কিভাবেই বা জোটাবে চাকরি রপ্ত করা অপাঙক্তেয় বিদ্যা দিয়ে?

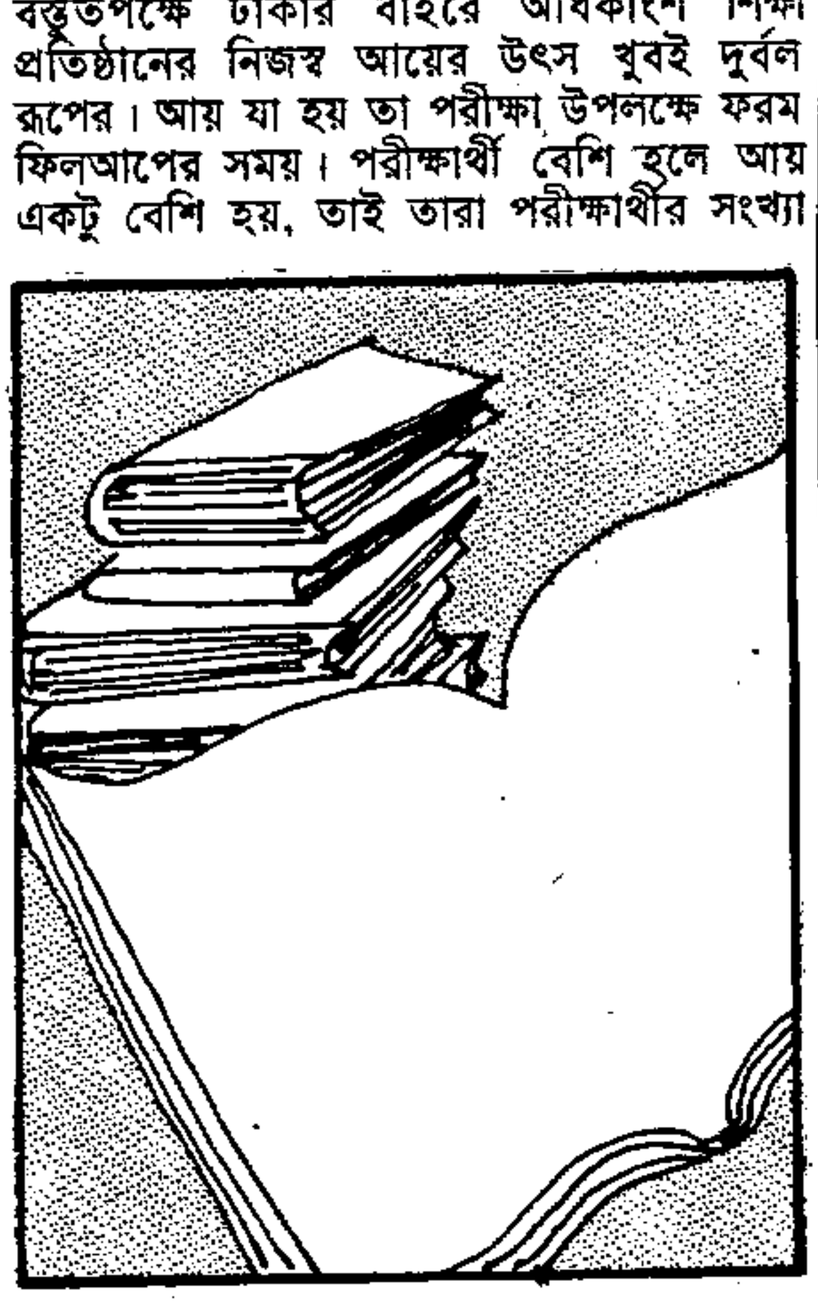

মফস্বলের কোনো কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের উৎসব চলে প্রতি বছর। এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি ও রিপোর্টিং হয় প্রত্যেকবারই, কিন্তু কোনো উন্নতি নেই। উপরন্তু এই নকলজ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে নতুন নতুন কেন্দ্র। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এমনটি হচ্ছে এটি নিশ্চিত। তারা সুযোগ করে দিচ্ছে নকলের যাতে পাসের হার বাড়ে। হার বাড়লে পরীক্ষার্থী বাড়বে, তাতে আয় বৃদ্ধি পাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের—